নেত্রীরা তিন ঘন্টা সময় হবে কি

বিশ দিনের সন্তানকে গ্রামের বাড়িতে রেখে আসে যে মা তার কষ্ট বুঝেন আপনি? সরলীকরণ করে বলা যায় তিনি নির্মম, অতি নির্মম। কিন্তু যদি জানেন তার সংগ্রামের কাহিনী তাহলে ধিক্কার দিবেন নিজেকে, তার চেয়েও বেশি রাজনীতি বিদদেরকে। এই সংগ্রামী নারী শিরিন তার স্বামী মজিবরকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে ছিলেন অভাবহীন এক সংসারের। শুধুমাত্র তিন বেলা আহার আর কোনো মতে একটু আবাসের। একুশ বছর বয়সেই পরিবারের হাল ধরেছিলেন মজিবর, তার সব স্বপ্নই বাস্তবতার মুখ দেখছিল স্কুটারটিকে ঘিরে। হরতালকারীরা তাকে এবং তার স্কুটারটি পুড়িয়ে দিয়েছে। এখন তার পরিবার দিন কাটাচ্ছে দেনার দুঃস্বপ্নে। আর রাজনীতিকরা আছেন নতুন মজিবরের সন্ধানে। তাদের সময় হয় না এদের খবর নেয়ার...

লিখেছেন **সাইফুল হাসান,** ছবি **ডেভিড বারিকদার**

মাননীয় দেশনেত্রী ও জননেত্রী,

আপনাদের হাতে কি তিন ঘন্টা সময় হবে? কষ্ট করে হলেও আপনাদের ব্যস্ততম সময় থেকে এটুকু সময় বের করে নিন। বাড্ডা হয়ে কাপাসিয়ার একটি গ্রামে নিয়ে যাবো আপনাদের। দেখবেন যাদের ভাতের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে মারামারি হানাহানিতে আপনারা ব্যস্ত, সেই হানাহানিতে নিহত স্কুটার চালক মজিবরের পরিবার এখন কেমন আছে। কিভাবে কাটছে তাদের দিন। দেখে আসুন এক হরতালে একটি পরিবারের সুস্বপ্ন কিভাবে বদলে গেল দুঃস্বপ্নে।

হরতালে নৃশংসতার ছবি আর খবর পত্রিকায় ছাপা হয়। জানা যায় আহত আর নিহতের সংখ্যা। কিন্তু নিহতের পরিবার কিভাবে জীবন যাপন করে তার সংবাদ আর পাওয়া যায় না। সম্পাদকীয় বৈঠকে আমরা ঠিক করলাম ২ এপ্রিল হরতালে নিহত মজিবরের মা, স্ত্রী ও দুই শিশু সন্তানের অবস্থা এখন কেমন তা বের করব। আমাদের কাছে তথ্য ছিলো ঘটনাটি ঘটে কুড়িল বিশ্বরোডে। ২১ এপ্রিল যখন কুড়িল পৌঁছলাম তখন বেলা ১১টা। এর ওর কাছে জিজ্ঞেস করি কেউই মজিবর সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিতে পারে না। হতাশ হয়ে ফিরবো ভাবছি, তখন এক সিগারেট দোকানদার দেখিয়ে দিলেন একটি গ্যারেজ। যে গ্যারেজে মজিবর বেবিট্যাক্সি

স্কুটারটি পুড়ে যাওয়ার সাথে সাথে ধূলিস্মাৎ হয়েছে শিরিনের স্বপ্ন

রাখতো। গ্যারেজে ঢুকতেই নূর ইসলাম এগিয়ে এলেন। তিনি দেখিয়ে দিলেন মজিবরের সঙ্গে পুড়ে যাওয়া তার স্কুটারটি। দেখতে দেখতে লোক জড়ো হয়ে গেল, যারা মজিবরের বন্ধু বা পরিচিতজন। গ্যারেজ মালিক শফিও এলেন। শফির কাছেই জানা গেল মজিবরের স্ত্রী শিরিন ঢাকাতেই আছে। পাশেই একটি গার্মেন্টসের অপারেটর তিনি। শফিকে সঙ্গে নিয়ে শিরিনের গার্মেন্টসে দেখা করতে গেলাম। শিরিনের কাছে জানা গেল বাচ্চা দুটি গ্রামে মজিবরের মায়ের কাছে আছে। সিদ্ধান্ত নিলাম মজিবরের মা ও বাচ্চা দুটিকে দেখতে তার গ্রামে যাবো। শিরিন ও গ্যারেজ মালিক শফিকে নিয়ে রওনা হলাম তার গ্রামের বাড়ি গাজীপুরের কাপাসিয়া থানার কুড়াতলা গ্রামে।

ডেটলাইন ২ এপ্রিল

যেতে যেতেই শিরিন ও শফি ঘটনার দিন সম্পর্কে বর্ণনা দিচ্ছিলেন। বিরোধী দলের ডাকা ৬০ ঘন্টা হরতালের দ্বিতীয় দিন ছিলো ২ এপ্রিল। হরতালে নিজের স্কুটারটি বের করেননি মজিবর। বরং হরতালের মধ্যে অবসর ভেবে সার্ভিসিং করিয়েছেন স্কুটারটির। ১ এপ্রিল সারা রাত ধরে গ্যারেজ মালিক শফি মেরামতের কাজ করেছেন। শফির সঙ্গে মজিবরও গ্যারেজেই ছিলেন। ২ এপ্রিল সকালে মজিবর বাসায় চলে আসেন। শফি দুপুর পর্যন্ত কাজ করে গ্যারেজেই ঘুমিয়ে পড়েন। সন্ধ্যার দিকে মজিবর বেবিট্যাক্সিটি গ্যারেজের সামনের রাস্তাতেই নিয়ে আসেন পরীক্ষা করার জন্য। গ্যারেজের পাশেই শিরিনের গার্মেন্টস।

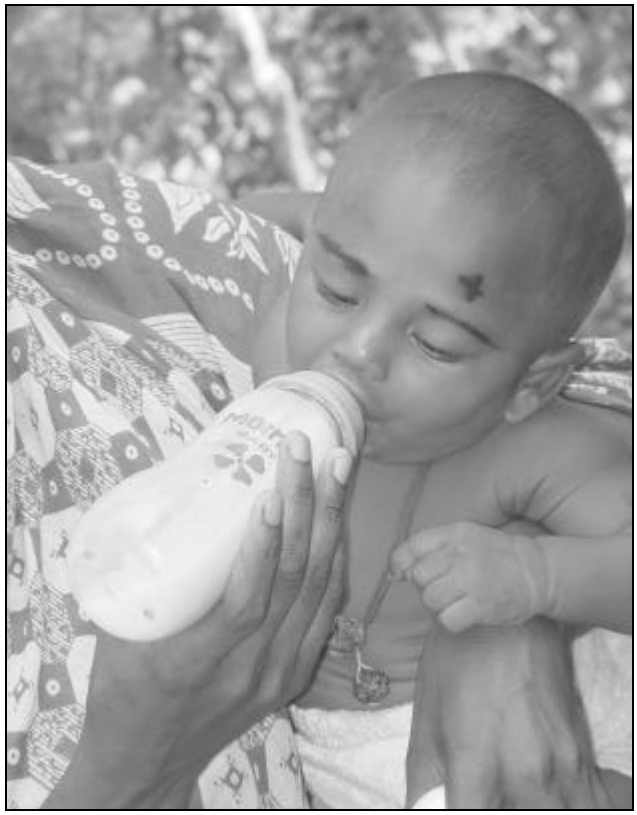

দেখবেন যাদের ভাতের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে মারামারি হানাহানিতে আপনারা ব্যস্ত, সেই হানাহানিতে নিহত স্কুটার চালক মজিবরের পরিবার এখন কেমন আছে। কিভাবে কাটছে তাদের দিন।

আগের সারারাত গ্যারেজে থাকার জন্য সকালে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়নি তার। ভেবেছিলেন সন্ধ্যায় স্ত্রীকে নিয়ে এক সঙ্গে বাসায় ফিরবেন। সিনহা গার্মেন্টসের সামনে আসা মাত্রই পেছন থেকে কিছু লোক তার গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। ব্যাস, ৩০ সেকেন্ডের মধ্যেই মজিবরের সব আশা, স্বপ্ন শেষ হয়ে যায়। আর এদিকে স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়নি বলে একটু আগেই

হরতালে নিহত, আহত ও গ্রেপ্তারের সংখ্যা

সাল	নিহত	আহত	গ্রেপ্তার
১৯৭২-৭৫	১	৩১২	৯০৭
১৯৭৫-৮২	৬	৫১৮	৩১১
১৯৮২-৯০	৯৪	২৫৬২	৩৫৮৬
১৯৯০-৯৬	৬৩	৫৬৫৮	৮০৬
১৯৯৬-২০০১	অনূর্ধ্ব ৪৫	৩৭২৭ ঊর্ধ্ব	৩৫৩০ ঊর্ধ্ব

শিরিন বাসায় চলে আসেন। স্বামীর জন্য যখন রান্না চড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন, তখন মজিবর গায়ে আগুন নিয়ে দৌড়ে বাঁচার চেষ্টা করছেন। তাকে বাঁচানোর জন্য লোকজনের কাছে কাকুতি-মিনতি করছেন। 'গ্যারেজের মধ্যেই ঘুমিয়ে ছিলাম। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে কেউ একজন এসে আমাকে বলল মজিবরের গাড়িতে কারা যেনো আগুন দিয়েছে। দৌড়ে গিয়ে দেখি মজিবরের শরীরে আগুন। লোকজন আগুন নেভাচ্ছে ওর শরীর থেকে। বেবিট্যাক্সিটি তখনও জ্বলছে।' ঘটনার বিবরণ দিতে দিতে বলছিলেন শফি। হরতালের দিন কোথাও একটা গাড়ি পাই না, পাশেই একটা ক্লিনিক ছিলো। সেখানে নিলাম, তারা ভর্তি করলো না। পরে একটা ভ্যানে করে মজিবরকে ঢাকা মেডিকেলে পাঠাই। তারপর বেবিট্যাক্সির আগুন নেভানোর চেষ্টা করি। সিনহা গার্মেন্টস থেকে একটা পানির পাইপ দিলে বেবির আগুন নেভাতে সমর্থ হই। কিন্তু ততক্ষণে বেবিট্যাক্সিটিও শেষ। এরপর ঢাকা মেডিকেল কলেজে গেলাম মজিবর ভাইয়ের চিকিৎসার খবর নিতে। হাসপাতালে যাওয়ার আগে আমাকে একটা কথাই বলেছিলেন তিনি। 'শফি ভাই, আমাকে বাঁচান। দুনিয়াতে আমার কেউ নেই। আমাকে বাঁচান।'

শিরিন বললেন, সে আমাকে কথা দিয়েছিলো গাড়ি বের করবে না। ঘটনার দিন আমি একটু আগেই বাসায় ফিরে যাই। রান্না চড়িয়েছি, এমন সময় একজন এসে খবর দেয় আমাদের বেবিট্যাক্সিতে

আগুন দিছে। একথা শোনার পর দিশেহারা হয়ে পড়ি। চুলা নিভিয়ে দৌড়ে রাস্তায় আসি। তখন শুনি যে মজিবরের গায়েও আগুন দিছে। কাঁদতে কাঁদতে দৌড়াতে থাকি। আমার অফিসের সামনে যেয়ে দেখি শফি ভাই বেবিট্যাক্সির আগুন নেভাচ্ছে। খবর পেলাম পাশের পলাশ মেডিকেলে নিয়ে গেছে তাকে। ওখানে যেয়ে দেখি ভর্তি করছে না। কতো কাকুতি-মিনতি করলাম। পলাশ মেডিকেলের লোকরা ভর্তি করতে রাজি হলো না। একটা ভ্যানের ওপর তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। তাকিয়ে দেখি তার শরীর এমনভাবে পুড়েছে যে শরীরের মাংস ঝলসে কুঁচকে গেছে। তিনি আমাকে বললেন মেডিকেলে নিয়ে যেতে। মেডিকেলে নিয়ে গেলাম। ডাক্তাররা বললেন এ রোগী বাঁচবে না। এ কথা শুনে বুকের মধ্যে একেবারে খালি হয়ে গেল। কারণ সে ছাড়া পৃথিবীতে আমাদের আর কেউ নেই। ৪ দিন হাসপাতালে থাকার পর সে চলে গেল। মাথায় দেনার পাহাড়। দুটো দুধের বাচ্চা আমাদের। কি যে করবো? তার কোনো সহায় সম্পত্তি নেই। গ্রামের বাড়িতে একটা মাত্র ঘর। সম্বল বলতে বেবি ট্যাক্সিটা ছিলো, তাও তো পুড়ে গেছে। আমরা কিভাবে বাঁচবো, বাচ্চা দুটিকে খাওয়াবো কি? বৃদ্ধ শাশুড়িকেই বা কি খাওয়াবো? আমি একা মেয়ে মানুষ, লেখাপড়া জানি না। গার্মেন্টসে চাকরি করে ২ হাজার টাকা পাই। ২ হাজার টাকায় এতোগুলো লোকের চলা সম্ভব?

শিরিনের এসব প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা ছিলো না। যারা মজিবরকে হত্যা করেছে, বেবিট্যাক্সি জ্বালিয়ে দিয়েছে তারাও জানে না। হরতাল ডাকা বিরোধী দল, সরকারে থাকা লোকজন তো কোনোভাবেই মজিবরদের খবরই নিতে চায় না। এরা যে কোনো মূল্যে ক্ষমতা বা ক্ষমতার কাছাকাছি থাকতে চায়। আর এর জন্য বলি হতে হয় মজিবর, সাইদুলদের। মজিবর, সাইদুল কিংবা হরতালের নৃশংসতার শিকার রিকশাচালক এসব খেটে খাওয়া মানুষের এই যেনো নিয়তি।

একটি স্কুটার অনেকগুলো জীবনের নিশ্চয়তা এবং অনিশ্চয়তা

১০-১১ বছর আগে ঢাকায় আসে মজিবর ও তার স্ত্রী। প্রথমে তারা থাকতেন উত্তর বাড্ডা এলাকায়। অভাব, দরিদ্রতা দূর করার জন্য ঢাকা এসেই ভ্যান চালাতে শুরু করেন মজিবর । স্ত্রী একটি গার্মেন্টসে কাজ নেন। দু'জনে মিলে যা আয় করতো তা থেকে নিজেরা খেয়ে পরে বাড়িতে মাকে টাকা পাঠিয়ে অল্প অল্প করে কিছু

২০০০ টাকায় কিভাবে চলবে শিরিনের সংসার

টাকা জমাতো। আরো বেশি আয় কিভাবে করা যায় এ চিন্তায় কাটতো মজিবরের দিন। একটু একটু করে তিনি ২০ হাজার টাকা জমা করেন। আর স্ত্রীকে বলতেন, যদি একটা বেবিট্যাক্সি কিনতে পারতাম তাহলে আয়ও বেশি হবে, অভাবও দূর হবে। স্ত্রী শিরিন মজিবরকে সাহস জোগাতেন– চিন্তা করো না, এক সময় অভাব থাকবে না। অর্থের অভাব ছাড়া তাদের ছিল সন্তানের অভাব। কবিরাজি চিকিৎসা করায় এই দম্পতির অবশেষে ৯ বছর পর ১৯৯৮ সালে প্রথম সন্তান নাইম জন্ম নেয়। এরপর মজিবর একটা স্কুটার কেনার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। গ্রামে থাকা মা ও একমাত্র সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে যে কোনো দায়িত্বশীল লোকেরই উদ্বিগ্ন হওয়া স্বাভাবিক। আয় বাড়ানোর জন্যই ৬ মাসের সন্তান নাইমকে গ্রামে তার দাদীর কাছে রেখে আসে এই দম্পতি। স্বামীকে সহযোগিতা করার জন্য শিরিন আবার গার্মেন্টসে চাকরি নেন। তিনি বলেন, 'অভাব ছিলো কিন্তু আমরা সুখী ছিলাম। মাঝে মাঝে নাইমের আব্বা আফসোস করতো। বেশি রোজগারের জন্য আমরা বেশি বেশি পরিশ্রম করতাম। এর মধ্যেই ৬ মাস আগে দ্বিতীয় সন্তান কাইমের জন্ম হয়। ২০ দিনের কাইমকে আমি ওর দাদীর কাছে রেখে গার্মেন্টসে কাজ শুরু করি। এতো কষ্ট করেছি শুধু অভাব দূর করার জন্য।' কাইম জন্ম নেওয়ার পর মজিবরের আফসোস দুশ্চিন্তায় পরিণত হয়। ঢাকায় বাসা ভাড়া দিয়ে বাড়িতে টাকা পাঠিয়ে একটি পয়সাও জমাতে পারছিলো না।

অবশেষে শিরিন তার ভাইয়ের মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ৪০ হাজার টাকা লোন নেয়। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে আরও ৩০ হাজার টাকা ধার করেন মজিবর। তারপর মাস ছয়েক আগে বেবিট্যাক্সিটি কেনেন। স্কুটারটি কেনার পর বাসা বদলে কুড়িল বিশ্বরোডে চলে আসেন। স্ত্রী এখানকার সিনহা গার্মেন্টসে কাজ নেন। বেবিট্যাক্সি কেনার পর ভালোই চলছিলো। প্রতিমাসে গ্রামীণ ব্যাংকের এগারোশ' টাকা কিস্তি শোধ, গ্যারেজ ভাড়া সাড়ে চারশ' টাকা দিয়ে দু'জনের আয় মিলিয়ে মজিবরের অভাব আস্তে আস্তে দূর হচ্ছিলো। বেশ কিছু ধারও তিনি শোধ করেছিলেন। বেবিট্যাক্সিটি ছিলো তার যক্ষের ধন। কারণ ৭০ হাজার টাকায় কেনা বেবিট্যাক্সিটি তার জীবন ধারণের নিশ্চয়তা ফিরিয়ে দিয়েছিলো। মজিবরের বন্ধু ও গ্যারেজ মালিক শফি জানান, বেবি কেনার পর একটি হরতালেও স্কুটার বের করেননি। হরতালে বেরোতে পারবে না বলে আগের দিন সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত গাড়ি চালিয়েছে বাড়তি রোজগারের আশায়। যাতে হরতালে রাস্তায় নামতে না হয়। যে হরতালকে দেখে এতো ভয়, অবশেষে সেই হরতালই মজিবরের জীবন কেড়ে নিলো। একটি বেবিট্যাক্সিকে ঘিরে যার পরিবারের সব স্বপ্ন, সুখের দিন গোনা, সেই বেবিট্যাক্সিও রেহাই পায়নি হরতালকারীদের হাত থেকে। যে বেবিট্যাক্সি ছিলো মজিবরের জীবনের, পরিবারের নিশ্চয়তা, সেটি এখন পুরো পরিবারের জন্য অনিশ্চয়তার কারণ

নাইমের কাছে বাবা মানে ঢাকায় থাকা এক পুরুষ, যে মাসে একবার তাকে দেখতে আসেন। বাবার পরিশ্রম বোঝার বয়স এখন তার হয়নি

হয়ে দাঁড়িয়েছে। মজিবরের স্ত্রী শিরিন বললেন, ' প্রতিমাসে গ্রামীণ ব্যাংকের কিস্তি দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই। গাড়ি সার্ভিসিংয়ের জন্য বিভিন্ন পার্টসের দোকান, গ্যারেজে ১০-১৫ হাজার টাকা ধার হয়েছে। ৪ দিন হাসপাতালে থাকার সময় আরও ১৪ হাজার টাকার মতো দেনা আমি করেছি। আত্মীয়-স্বজন টাকা পায়। এতো টাকা আমি শোধ করবো কিভাবে! দুই হাজার টাকা বেতন দিয়ে ছেলে দুটোর জন্য দুধ কিনবো, শাশুড়ির খরচ দেবো কি আর আমিই বা খাবো কি? পাওনাদাররা অনেকেই টাকা মাফ করে দিয়েছে। যারা মাফ করেনি তাদের টাকা তো শোধ করতে হবে। পাওনাদারদের বলেছি ধৈর্য ধরতে, আস্তে আস্তে সবার দেনা আমি শোধ করবো। আবার বেবিটা সারিয়ে ভাড়া দেবো তারও উপায় নেই। এটা মেরামত করতে প্রায় ৩৫ হাজার টাকা লাগবে। ধার শোধ করা এখন আমার কাছে দুঃস্বপ্নের মতো। শুধু জানি শোধ করতে হবে। কিভাবে সেটা জানি না।

ট্যাক্সি ক্যাবে যেতে যেতে আড়াই ঘন্টা ধরে শিরিন তার দুঃখের কথা বলছিলেন আমাদের।

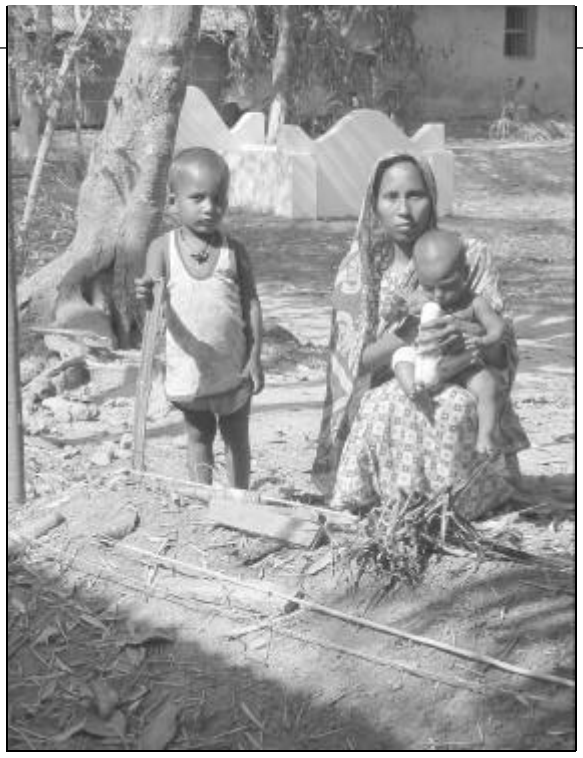

শিরিন তার দরিদ্রতা দেখাতে উদগ্রীব নন। তিনি জানেন শোক আর সহানুভূতি দিয়ে তার জীবন চলবে না। আবেগ, মায়া অনুভূতি এসব তার ঘরের চুলা জ্বালাবে না

কুড়াতলা গ্রাম : এক নির্মম অভিজ্ঞতা

ঢাকা থেকে প্রায় ৮০ কি.মি দূরে মজিবরের গ্রাম। কাপাসিয়া থানার কুড়াতলা গ্রামে পৌঁছাতে বেলা তিনটা। প্রচন্ড গরমে সবার অবস্থা কাহিল। কবির বাজারে গাড়ি রেখে এক কি.মি. হাঁটার পর মজিবরের গ্রাম। মানুষ যে কতো দরিদ্র হতে পারে মজিবরের বাড়ি গেলে বোঝা যায়। বাড়ির ভিটেটুকুর পরিমাণ এক শতাংশ জমিরও কম। বাড়িতে নতুন মাটি উঠানো হয়েছে। ভিটেতে একটি মাত্র ঘর মাটির। ঘরের গা ঘেঁষে মজিবরের কবর। তাও অন্যের জমিতে। ঘরের মধ্যে একটি চৌকি পাতা। একটি পাতিলে আগের দিন রাতে রান্না করা পান্তা ভাত। ছোট একটি পাত্রে সামান্য একটু তরকারি রয়েছে। ঘরের ভেতর একটি দোলনা টাঙানো মজিবরের ছোট ছেলের জন্য। যখন মজিবরের ভিটেয় পৌঁছালাম, দেখা গেলো দু'তিনজন লোক মজিবরের কবর পরিচর্যা করছে। বড় ছেলে নাইম কবরের পাশে বসে আছে। ছোট ছেলে কাইম ঘুমিয়ে আছে। একজন মজিবরের ছেলে নাইমকে দেখিয়ে দিলেন। নাইমকে জিজ্ঞেস করলো কেউ একজন, তোমার বাবা কোথায়? নাইমের ভাবলেশহীন উত্তর, 'আগে ঢাকা থাকতো, এখন মরে গেছে'। এভাবেই ও কথা বলে। কেন না বাবা মানে তার কাছে ঢাকায় থাকা এক পুরুষ যে মাসে দুবার এসে তাকে দেখে যায়। নাইমের জন্য বাবার পরিশ্রম বোঝার বয়স এখনও হয়নি। তাই হয়ত বাবার কবর তাকে কাঁদায় না। কিন্তু তার অবচেতন মনই হয়ত এই পরিবেশে তাকে নির্বাক বানিয়ে ফেলেছে। এখন ওর চাহনি, নিষ্পাপ মুখশ্রী দেখে যে কোনো মানুষেরই বুকের ভেতর কেঁদে উঠবে। নিষ্পাপ এই শিশুর পিতাকে যারা হত্যা করেছে তাদের কি বিচার হবে? এই প্রশ্নটি করলেন পাশে দাঁড়ানো এক মহিলা। নাইমের মা আমাদের সঙ্গে গ্রামে ফিরেছে। নাইম মাকে পেয়ে এক মুহূর্তের জন্যও কাছছাড়া হচ্ছিলো না। মজিবরের মায়ের খোঁজ নিয়ে জানা গেলো তিনি বাড়িতে নেই। প্রতিবেশী এক মহিলা জানালো, বৃদ্ধা ৬ কি.মি. দূরে কাপাসিয়া বাজারে গেছে একটি ফ্লাস্ক কিনতে। কারণ ছোট কাইমের দুধ রাখার জন্য এটি প্রয়োজন। প্রচন্ড রোদের মধ্যে একজন বৃদ্ধা কি করে অত পথ হেঁটে যাবে আসবে ভাবতেই আমরা শিউরে উঠলাম। একথা জিজ্ঞেস করতেই পাশ থেকে একজন বললেন 'জীবন যেখানে যেমন'। ছোট বাচ্চাকে পাশে নিয়ে শিরিন কথা বলছিলেন। এ সময় মজিবরের দুলাভাই সফুরউদ্দিন ব্যাপারী এসে বলতে থাকেন, স্যার টাকা-পয়সা যদি কিছু পাওয়া যায় তা যেন ছেলে দুটোর নামে দেয়া হয়। একই কথা বার বার বলতে থাকলেন। পরিবারের একমাত্র ছেলে মারা গেছে। এই পরিবার কিভাবে বেঁচে থাকবে সে চিন্তা কারো নেই। অন্যান্য প্রতিবেশীরাও যেনো সফুরউদ্দিনের সঙ্গে গলা মেলালেন। গ্রামবাসীর অনেকের ধারণা, মজিবরের স্ত্রী সরকার বা অন্যদের কাছ থেকে অনেক টাকা পাবে। এই টাকা নিয়ে শিরিন আবার বিয়ে করতে পারে। বাচ্চাদের ফেলে যেতে পারে। বারবার একই কথা শুনে শিরিন বিরক্ত হয়ে বললেন, দেখেন তাদের ধারণা। দুধের বাচ্চাদের রেখে আমি কোথায় যাবো!

অভাব-অনটন মানুষকে কতোটা অবিশ্বাসী করে তোলে মজিবরের বাড়ির ঘটনাগুলোই তার প্রমাণ। মজিবরের মৃত্যুর মাত্র ১৫ দিন পরেই এসব কথা উঠেছে। যে মহিলা মজিবরের সঙ্গে টানা ১১ বছর ঘর করেছে তাকে মজিবরের গ্রামবাসী বিশ্বাস করছে না। সদ্য প্রয়াত একজন মানুষের বাড়িতে এসব ঘটনা জীবনের দীনতাগুলোকেই উন্মুক্ত করে। বাড়ির উঠোনে বসে শিরিন বলছিলেন, আমাদের ইচ্ছা ছিলো গ্রামে কোনো জায়গায় একটু জমি কিনে একটা বাড়ি করবো। আমাদের নাইম-কাইম স্কুলে যাবে। আমার শাশুড়ি ঘর-সংসার সামলাবে। আমরা দু'জন আয় করবো। কিন্তু কিসের থেকে যে কি হয়ে গেলো বুঝতেই পারলাম না। আমি ভাবতেই পারিনি ও মরে যাবে। ৬ তারিখ দুপুরে আমার কাছে কলা ও দুধ চাইলো। আমি দিলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি আমাকে বললেন গোসল করে খেয়ে-দেয়ে তার কাছে শুয়ে থাকতে। তার আগে ঘুম পাড়িয়ে দিতে বললেন। আমি তাকে ঘুম পাড়িয়ে ভাত খেয়ে যখন শুতে যাবো, দেখি সে নিঃশ্বাস নিচ্ছে না। আমি ডাক দিলাম, সে উত্তর দেয় না। চিৎকার করে ডাক্তার ডাকলাম। ডাক্তার বললেন অনেক আগেই মারা গেছে। আমি যখন ঘুম পাড়িয়ে

বিভিন্ন শাসনকালে হরতাল

সাল	মোট
১৯৭২-৭৫ (১৪ আগস্ট)	২২ দিন
১৯৭৫-৮২ (১৫ আগস্ট- ২৩ মার্চ)	৫৯ দিন
১৯৮২-১৯৯০ (৪ মার্চ- ৬ ডিসেম্বর)	৩২৮ দিন
১৯৯০- ১৯৯৬ (৭ ডিসেম্বর- ৩০ ডিসেম্বর)	৪১৬ দিন
১৯৯৬-১৯৯৯ (৩১ মার্চ- ৩১ ডিসেম্বর)	২৪৪ দিন
	১০৬৯ দিন
১৯৯৯-২০০১ (৩১ ডিসেম্বর- ২৫ এপ্রিল) অনূর্ধ্ব-	৪০ দিন
	১১০৯ দিন

দিলাম তখনই সে চিরজীবনের জন্য ঘুমিয়ে গেছে। শিরিনকে জিজ্ঞাসা করলাম তার কাছে জানতে চাননি তার কিছু হলে আপনি কি করবেন? শিরিনের উত্তর 'না'। মনে হয়েছে, তারপরও জিজ্ঞেস করিনি। যদি সে মনে কষ্ট পায়! আর আমার চিন্তায়ই আসেনি নাইমের বাবা মরে যাবে। কারণ হাসপাতালে আমাকে সে বলতো, সুস্থ হয়ে যেভাবেই হোক বেবিট্যাক্সিটা মেরামত করবো। দুইজন যে পরিশ্রম করি তারচেয়ে ডাবল পরিশ্রম করবো। সব পাওনা শোধ করে নাইমের দাদীকে আমাদের সঙ্গে এনে রাখবো। এতো কিছুর পরও তার মায়ের যেন কোনো কষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে বলতো মজিবর। আমাদের কষ্ট হতো। তারপরও সে প্রতি ১৫ দিন পরপর বাড়ি আসতো মাকে দেখতে। আমি প্রতি সপ্তাহে বাচ্চা দুটিকে দেখে যেতাম। যতো কষ্টই হোক মার জন্য কিছু না কিছু টাকা সে পাঠাতোই। শুধুমাত্র দেনা শোধ আর বাড়ির উন্নতির জন্য আমরা দু'জন আদরের বাচ্চা দুটোকে বাড়ি রেখে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম।

শফিরা মহানুভবতা দেখাতে পারেন। আমাদের রাজনীতিবিদরা তাও পারেন না

প্রায় দেড় ঘন্টা অপেক্ষার পরও মজিবরের মা এলেন না। কথা প্রসঙ্গে শিরিনের কাছ থেকে জানলাম কিছু সাহায্যের আশায় প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি দরখাস্ত পাঠিয়েছেন। মূলত তারপর থেকেই সফুরউদ্দিনের ধারণা শিরিন অনেক টাকা পাবে সরকারের কাছ থেকে। আমরা যখন ফিরছি শিরিন তখন প্রতিবেশী কাউকে বললো বাচ্চা দুটোকে দূরে কোথাও নিয়ে যেতে। কারণ তার ঢাকা যাওয়া দেখলে বাচ্চা দুটো কাঁদবে। তাতে মায়ের মনও কাঁদবে। নাইম ও কাইমকে কেউ একজন দূরে নিয়ে গেলো। ওদের মা জীবনযুদ্ধের সৈনিক হিসেবে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে শামিল হওয়ার জন্য ঢাকা অভিমুখে রওনা হলো। শিরিন কথায় কথায় বললো, আগে আমরা দু'জন চেষ্টা করতাম। এখন আমি একাই চেষ্টা করবো। মরে যেতে যেহেতু পারবো না সেহেতু নিজে বাঁচার ও পরিবারের সবাইকে বাঁচানোর চেষ্টা তো করতে হবে। একদিকে সদ্য প্রয়াত স্বামী হারানোর শোক, দুধের দুই সন্তানকে রেখে দূরে একলা থাকা, অন্যদিকে বেঁচে থাকার সংগ্রাম। মানুষের জন্য এরচেয়ে নির্মম অভিজ্ঞতা কি হতে পারে? এই পরিবারের আর কোনো পুরুষ সদস্য নেই শিশু নাইম ও কাইম ছাড়া। একটি হরতাল হতদরিদ্র এই পরিবারটির ভবিষ্যত নষ্ট করে দিয়েছে। স্বপ্নহীন এই মানুষগুলো তীব্র কষ্ট ও দুঃখের মধ্যেই এগিয়ে যাবে। এই কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেলো– যখন ফিরছি দূর থেকে একজন চিৎকার করে মজিবরের স্ত্রীকে বললেন মাসে মাসে টাকা পাঠাস। তোর শাশুড়ি ও বাচ্চা দুটো খেয়ে বাঁচবে। শিরিন বললো,পাঠাবো। কিভাবে পাঠাবে তা শিরিন জানে না।

মানুষ মানুষের জন্য : রাজনীতিবিদরা নিজেদের জন্য

রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের বেঁচে থাকার অধিকার আছে। রাজনীতিকরা এ কথাটি প্রায়ই বলেন। তারা যে মিথ্যে কথা বলেন এটাও সত্যি। মজিবরের মৃত্যুর পর এ পর্যন্ত কেউ তার স্ত্রী বা মার সঙ্গে দেখা করেনি। বাড্ডা থানার মধ্যে ঘটনাটি ঘটে। বাড্ডা থানার ওসি শিরিনের সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন বোধ করেনি। এমনকি মজিবর যখন হাসপাতালে ছিলো তখনও পুলিশ ঘটনার তদন্তের জন্য তার সঙ্গে দেখা করেনি। সরকারী দল, বিরোধী দলের থানা বা ইউনিট পর্যায়ের কোনো নেতাও সহানুভূতি জানাতে যায়নি। মজিবরের এলাকার সংসদ সদস্য আফসার উদ্দিন আহমেদ। তার সঙ্গে মজিবরের মা দেখা করেছিলো। আফসার উদ্দিন এই পরিবারকে কিছু সাহায্য দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু হত্যার বিচার নিয়ে একটি কথাও বলেনি। ব্যস, এ পর্যন্তই। আমরা যেদিন মজিবরের বাড়িতে যাচ্ছি সেদিন একই ফেরীতে আফসারউদ্দিন যাচ্ছিলেন তার নির্বাচনী এলাকাতে। তিনি চেনেন না মজিবরের স্ত্রী শিরিনকে। চেনার দরকারও হয়ত নেই। তিনি জানেন এখনও ভোট চাওয়ার সময় হয়নি।

হাসপাতালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হরতালে আহত ব্যক্তিদের দেখতে গিয়েছিলেন। সে সময়

পরিকল্পিত হত্যা এটি? হত্যাকারী কারা

মজিবরকে কি হরতালের সুযোগে হত্যা করা হয়েছে? তার সঙ্গে কি অন্য কারো পূর্বশত্রুতা ছিলো? কেউই স্বীকার করলেন না তার সঙ্গে কারো পূর্বশত্রুতা ছিলো । তদন্তে জানা গেছে, মজিববের গায়ে যারা পেট্রোল ঢেলে দিয়েছিলো তাদের একজনকে তিনি চিনতে পারেন। তার নাম আলম। আলম কুড়িলেই একটি স' মেশিনে চাকরি করে। ঘটনার দু'তিন দিন আগে গভীর রাতে আলমের সঙ্গে মজিবরের ঝগড়া হয়। ঝগড়ার দিন গভীর রাতে গ্যারেজে গাড়ি রাখার জন্য আসে মজিবর। গ্যারেজের সামনে আলম মদ খেয়ে ৪ জন হিজড়ার সঙ্গে বসে আড্ডা মারছিলো। গ্যারেজে গাড়ি ঢোকতে গেলে আলম বাধা দেয়। আলমকে মজিবর বোঝানোর চেষ্টা করে এটি তার গ্যারেজ। কিন্তু আলম বেবিট্যাক্সি ঢোকাতে না দিলে মজিবর পেট্রোল পুলিশ ও গ্যারেজ মালিক শফিকে ডেকে আনে। পুলিশ ডাকতে যাওয়ার সময় আলম মজিবরকে হুমকি দেয়। পুলিশ আসা দেখে কেটে পড়ে আলম। এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন গ্যারেজ মালিক শফি। তিনি বলেন, 'রাত ৩টা ৪টা হবে। আমি এসে দেখি আলম চলে গেছে। মজিবর ভাই আমাকে ঘটনাটি জানায়। তারপর ঘুম থেকে জাগানোর জন্য তাকে আমি একটু তিরস্কার করি। আমি শুনেছি হাসপাতালে তিনি আলমের কথা বলে গেছেন। ঐ ঘটনার জের যে এমন হতে পারে আমি ভাবতেই পারিনি। মজিবরের স্ত্রী বলেন, 'হাসপাতালে আমি তাকে বারবার জিজ্ঞেস করেছি যারা হামলা করেছে তাদের চেনে কি না? প্রথম দিকে কিছুই বলতো না, চুপ করে থাকতো। মরার আগের দিন আলমের কথা স্বীকার করে। তবে অন্যদেরকে চেনে না। আসলে আমার কাছে কিছু বলতে চাইতো না। ভাবতো মেয়ে মানুষ তার কিছু হয়ে গেলে আমি বিপদে পড়বো। লোকটা বুঝলো না তার না থাকা মানেই বিপদের মধ্যে থাকা।' মজিবরের স্ত্রীর কাছ থেকে জানা গেলো আলম এখন পলাতক। তবে এয়ারপোর্ট এলাকায় মজিবরের এক বোন থাকে। শিরিন জানালো, তাকে মজিবর অনেক কিছু বলে গেছে। মজিবর হত্যাকাণ্ডে পুলিশবাদী একটা মামলা হয়েছে। মৃত্যুর দিন বাড্ডা থানার দু'জন পুলিশ মজিবরের স্ত্রীকে একটি কাগজে স্বাক্ষর দিতে বলে। শিরিন স্বাক্ষর করেনি।

মজিবর হত্যার বিচার হবে কি না কেউ বলতে পারে না। নাইম ও কাইম বড় হয়ে তার বাবার হত্যার কারণ খুঁজে পাবে না। দুঃখে-কষ্টে এক ধরনের অসহায়ত্ব নিয়েই হয়তো বড় হবে।

ডাক্তাররা শিরিনকে ওয়ার্ড থেকে বের করে দিয়েছিলো মন্ত্রীর নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে।

শিরিন জানালেন, মন্ত্রী সবাইকে সরকারি চিকিৎসা দেয়ার কথা বলে গিয়েছিলেন। আমরা এক ব্যাগ রক্ত ও ২টি ইঞ্জেকশন ছাড়া আর কিছুই পাইনি। ঐ সময় ওষুধ কেনার জন্য ১৪ হাজার টাকা লেগেছে। মন্ত্রী এসব জায়গায় যান আর বিটিভি সংবাদে ফলাও করে তা প্রচারিত হয়। কিন্তু মন্ত্রীর দেয়া দুই হাজার টাকা যে শিরিনের হাতে পৌঁছায়নি তা খবরে আসে না। এসব নিয়ে নেতাদের মাথা ব্যথা নেই। তাদের দরকার টিভিতে নিজেদের চেহারা দেখানো।

মজিবর দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর তার সাহায্যে এগিয়ে এসেছে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। চিকিৎসার জন্য একসঙ্গে ১৪/১৫ হাজার টাকা মজিবরের পরিবারের কাছে দুঃস্বপ্নের মতোই। তারপরও বেবিট্যাক্সিচালক, রিকশাচালক, গার্মেন্টস কর্মীরা প্রত্যেকেই সাধ্যমতো এগিয়ে এসেছে। এরা কেউই মজিবরের নিকটাত্মীয় নয়, পরিচিত। শুধু তাই নয়, যারা মজিবরের কাছে টাকা পেতো তারা অনেকেই টাকা শোধ দিতে হবে না বলে শিরিনকে জানিয়ে দিয়েছে। এদের একজন মজিবরের বন্ধু ও গ্যারেজ মালিক শফি। শফি বলেন, আমি দশ হাজার টাকা পেতাম, মাফ করে দিয়েছি। আমি তো জানিই সারা জীবন চেষ্টা করেও ভাবী এ টাকা শোধ করতে পারবেন না। আর শোধ করার মতো কেউ তো নেই। তাই টাকার আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি। ঘটনার দিন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমি মজিবর ভাইয়ের পাশে থেকেছি। কুড়িল আসার পর থেকে তার সঙ্গে আমার আলাপ। কি কষ্টে ধার করে বেবি কিনেছে সেটাও আমি জানতাম। এরপরও তার স্ত্রীর কাছে পাওনা টাকা চাই কিভাবে?

মজিবরের ভগ্নিপতি সফিউদ্দিন ব্যাপারি

শফিরা মহানুভবতা দেখাতে পারে। আমাদের রাজনীতিবিদরা তা পারেন না। রাজনীতিকরা নিজেদের জন্য। একজন মজিবরকে যতো নৃশংসভাবেই হত্যা করা হোক না কেন তাদের কিছু এসে যায় না। তারা রাজনীতিবিদ, মানুষ নয়।

ক্ষমতায় আসা এবং যাওয়ার জন্য যতোজন মজিবরকে হত্যা করা লাগুক না কেনো তাদের কিছু আসে যায় না। কারণ তাদের সন্তানরা রাস্তায় থাকে না। ক্ষিধের কষ্ট তারা পায় না।

সম্পাদকীয় আলোচনায় আমরা চিন্তা করছিলাম প্রচ্ছদে এই প্রতিবেদনের হেডিং কি দেয়া যায়, প্রচ্ছদে কেমন ছবি দেব। পত্রিকার কারণেই আমাদেরকে অনেক কিছু আগাম ভাবতে হয়। ভাবনাটা অনেকটা এরকম ছিল- শিরিন কাঁদতে কাঁদতে কাহিনীর বর্ণনা করবে। সন্তানের জন্য হয়ত সাহায্য চাইবে। অসহায় ভেঙে পড়া দরিদ্র এক নারীকে হয়ত আমরা প্রচ্ছদে আনতে পারব। কিন্তু শিরিন অসহায় দরিদ্র হলেও ভেঙে পড়েননি। ছয় ঘন্টা তার সঙ্গে থেকেছি। এক ফোঁটা অশ্রু তিনি ফেলেননি। কবরের সামনে গিয়েও তিনি থেকেছেন স্থির। কথার গতি কমেছে কিন্তু কষ্টে আটকায়নি তার কণ্ঠ। ডেভিড বারিকদার গ্রামে পৌঁছেই যখন ক্যামেরায় ধরেছেন শিশু কাইমকে সম্পূর্ণ খালি গায়ে তখন শিরিন বাধা দিয়েছেন। দৌড়ে ঘর থেকে নিয়ে এসেছেন কাইমের একমাত্র পরিষ্কার সুন্দর হলুদ প্যান্টটি। পরিয়ে দিয়ে বলেছেন, 'এখন তুলেন'। শিরিন তার দরিদ্রতা দেখাতে উদগ্রীব নন। তিনি জানেন শোক আর সহানুভূতি দিয়ে তার জীবন চলবে না। আবেগ, মায়া অনুভূতি এসব তার ঘরের চুলা জ্বালাবে না। পারবে না সন্তানের দুধ জোগাড় করতে। এজন্যই ছয় মাসের দুধের সন্তানকে রেখে তিনি আমাদের সাথেই ফিরে আসেন ঢাকায়। কেননা কাজে একদিনের অনুপস্থিতি তার মাসিক বেতন থেকে সত্তর টাকা কেটে রাখবে। এই সত্তর টাকার কোনো মূল্যই নেই আমাদের তথাকথিত দেশনেত্রী খালেদা জিয়া অথবা জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে। তাই তারা সময় পান না শিরিনের সংগ্রামের খবর নিতে।

নেত্রীরা, আপনাদের কাছে অনুরোধ একটু দেখে আসেন এই পরিবারকে। বুঝবেন মানুষ কত কষ্টে আছে। আর আপনারা কোন রাজমহলে আছেন।

এখন তিন ঘন্টা সময় হবে কী?

হরতালে ক্ষতি : বিটিভি স্বীকার করে না

হরতাল গণতান্ত্রিক অধিকার। জনগণ ইচ্ছা করলে হরতাল স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করবে কারো ইচ্ছা না হলে করবে না। এটাই হরতালের মৌলিক ধারণা। কিন্তু বাংলাদেশে হরতাল গণতন্ত্র হরণের হাতিয়ার বলে বিবেচিত হচ্ছে। দুই নেত্রীর বিবৃতিতে মনে হয় দেশের সব জনগণ হরতালের পক্ষে বা বিপক্ষে। এতে রাজনীতিবিদদের লাভ হলেও জনগণের কোনো লাভ হয় না। জনগণ মরুক বা বাঁচুক তাদের লাভ একটাই– নেত্রীদের কাছ থেকে তারা অভিনন্দিত হয়। রাজনীতিবিদ-জনগণ উভয়ের বিশাল ও অল্প লাভ হলেও ক্ষতি হয় দেশের। এরশাদের সময় তিনি বলতেন, হরতালে দেশে প্রতিদিন ক্ষতি হয় ১৫০ কোটি টাকা। খালেদা জিয়ার শাসনামলে পূর্তমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম বলেছিলেন, হরতালে একদিনে দেশের ক্ষতি ২৫০ কোটি টাকা। শেখ হাসিনার অর্থমন্ত্রী শাহ্ এএসএম কিবরিয়া বলেছেন, একদিনের হরতালে ক্ষতি ৩৮৬ কোটি টাকা। বিজেএমই আনিসুর রহমান সিনহার হিসাবে একদিনের হরতালে শুধুমাত্র গার্মেন্টস সেক্টরেই ক্ষতি হয় ১০০ কোটি টাকা। সবাই একটি কথা স্বীকার করেছেন, হরতালে ক্ষতি মূলত অর্থনীতির, দেশের জনগণের। সবাই জানার পরও বিজেএমই বাদে কোনো দলই কিন্তু হরতাল ডাকতে দ্বিধা করে না। অথচ এসব রাজনীতিবিদরা দেশপ্রেমের কথা তুলতে তুলতে মুখে ফেনা তুলে ফেলেন।

গত ৩০ বছর জাতীয় পর্যায়ে হরতাল হয়েছে প্রায় ২৫০টি। শাহ্ এএসএম কিবরিয়ার হিসাবে হরতালে এ পর্যন্ত মোট ক্ষতির পরিমাণ ২৫০ ৩৮৬ = ৯৬,৫০০ কোটি টাকা। যদিও এই সময়ে টাকার অবমূল্যায়ন হয়েছে অনেকবার। এর মধ্যে দেশের অর্থনীতিও বেড়েছে। যদিও এই হিসাবের মধ্যে শুধুমাত্র ব্যবসা সংক্রান্ত হিসাবকেই আনা হয়েছে। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাব করলে এই হিসাব দ্বিগুণেও দাঁড়াতে পারে।

অবশ্য বিটিভি যারা দেখেন তারা এই হিসাব মানতে চাইবেন না। কারণ বিটিভি'র হিসাবে হরতালের সময় রাস্তায় যানবাহন চলে, ব্যবসা-বাণিজ্য হয়, শেয়ার বাজারের লেনদেন ঠিকমতো হয়। অর্থাৎ জীবনযাত্রা স্বাভাবিক থাকে। আবার সরকার বিরোধী দলের কাছে কাকুতি-মিনতি করছে হরতাল না দিতে। আওয়ামী লীগ যখন বিরোধী দলে ছিলো তখন বিএনপিও তাই করতো। সব সরকারই হরতালে দেশের অর্থনীতির ভয়াবহতা জনগণের সামনে তুলে ধরে। কিন্তু সরকার নিয়ন্ত্রিত টেলিভিশন যখন বলে দেশের সবকিছু স্বাভাবিক ছিলো, তখন ধরে নিতেই হয় যে, সরকার নতুবা বিটিভি মিথ্যা কথা বলছে। সরকারের এই দ্বিমুখিতায় সরকারের অস্বচ্ছতাই প্রমাণ করে।